[হাতুড়া বান্ধার ইজতিমায় প্রদত্ত বয়ানের শারঈ নিরীক্ষণ]

মাওলানা সাদ সাহেব

সমীপে

কিছু নিবেদন

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি

উসতাযুল হাদিস

নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে কিছু নিবেদন [১]

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

মাওলানা সাদ সাহেব সমীপে
কিছু নিবেদন

[হাতুড়া বান্ধার ইজতিমায় প্রদত্ত
বয়ানের শারঈ নিরীক্ষণ]

সংকলক
মাওলানা মুহাম্মদ যায়দ মাযাহেরি হাফিযাহুল্লাহ
উসতাযুল হাদিস, নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ, ভারত

অনুবাদ
আবদুল্লাহ আল ফারুক

মাকতাবাতুল আসআদ

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৭ ঈ.
রবিউল আউয়াল ১৪৩৭ হি.

গ্রন্থস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

মাকতাবাতুল আসআদের পক্ষে আশুলিয়া, ঢাকা থেকে প্রকাশক আবদুল্লাহ আল ফারুক কর্তৃক প্রকাশিত ও মাকতাবাতুল আযহার দোকান নং-১ আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে পরিবেশিত এবং জননী প্রিন্টিং প্রেস ১৯ প্রতাপদাস লেন, সিংটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
১২৮ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
☎ : 02 988 15 32
📱 : 019 24 07 63 65

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ১
দোকান নং- ১, আন্ডারগ্রাউন্ড,
ইসলামী টাওয়ার বাংলাবাজার,
ঢাকা 📱 017 15 02 31 18

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র : ২
৩৩, ৩৪, ৩৫ কিতাব মার্কেট
জামিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি,
ঢাকা 📱 : 019 75 02 31 18

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
বর্ণবিন্যাস : মাদিনা বর্ণশীলন, alfaruque1983@gmail.com

মূল্য : ৪০ [চল্লিশ] টাকা মাত্র

MAOLANA SAD SAHEB SOMIPE
KICHU NIBEDON
Published by : Maktabatul Asad. Dhaka, Bangladesh
Price : Tk. 40.00 US $ 10.00 only.

সূ চি

মুসা আলাইহিস সালামের নির্জন বাস
ও বনি ইসরাঈলের ধর্মত্যাগ ৭
প্রথম কথা ৯
দ্বিতীয় কথা ৯
তৃতীয় কথা ১১
চতুর্থ কথা ১২
পঞ্চম কথা ১৩

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের
পর দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে অবহেলার কারণে
ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়েছিল’ এ কথা কি সঠিক? ১৭

কিছু বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি
১. সুন্নতের প্রকারভেদ ২২
২. বিলায়াতের পথ কি নবুওয়াতের পথ নয়! ২৩
৩. তাবলীগি নেসাবের বাইরের বই কি পড়া যাবে না!? ২৪

আরেকটি অনুরোধ
১. নামায কি খুরুজের তারগিব মাত্র! ২৮
২. সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি তাওহিদ
ও তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ করেছিলেন? ২৯

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মুসা আলাইহিস সালামের নির্জন বাস ও বনি ইসরাঈলের ধর্মত্যাগ

হাতুড়া বান্ধায় অনুষ্ঠিত ইজতিমায় সাধারণ মজলিসে আপনি আপনার ওয়াযে দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও উপকারিতার কথা আলোচনাকালে সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেখানে আপনি এ কথাও বলেছিলেন যে, 'মুসা আলাইহিস সালাম হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে নিজ জাতি ও জামাত ছেড়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার উদ্দেশ্যে একাকীত্ব ও নির্জনবাস গ্রহণ করেছিলেন। তখন জাতির অবস্থা এতোটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈল গুমরাহ হয়ে যায় (মুরতাদ হয়ে যায়)। এ ঘটনা উল্লেখ করে আপনি উপসংহারে বলেছেন যে, 'ওই সময় প্রধান ছিলেন মুসা আলাইহিস সালাম। তিনিই মূল যিম্মাদার ছিলেন। মূল যিম্মাদারের সার্বক্ষণিক অবস্থান আবশ্যক। হারুন আলাইহিস সালাম তো স্রেফ সহকারী ও সহযোগী ছিলেন।' এ কথা প্রমাণিত করার জন্যে আপনি কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন—

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى ○ قَالَ هُمْ أُولاء عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى○

وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ○ هَارُونَ أَخِي ○ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ○ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي○

এই পুরো বয়ানের মাধ্যমে আপনি এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এবং উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীও এ কথা বুঝতে পেরেছেন যে, 'জামাত ছেড়ে একাকীত্ব ও নির্জনবাস গ্রহণ করার পরিণতিতে (চাই এ পদক্ষেপ কোনো

নবি বা অন্য কেউ নিক) এত ব্যাপক গুমরাহি চলে আসে যে, ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বনি ইসরাঈলি গুমরাহ হয়ে গেছে। বিষয়টি আপনি দলিল-প্রমাণ সহকারে এতটা হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করেছেন যে, শ্রোতামণ্ডলী তা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিল। আপনার কথাগুলো সবার অন্তরে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

যদি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে, আপনার কথাগুলোর পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায়,

১. মুসা আলাইহিস সালাম অনেক বড় ভুল করেছেন। তিনি জামাত ও জাতি ছেড়ে আল্লাহর সঙ্গে নিভৃত আলাপ করার উদ্দেশ্যে নির্জনবাস করার মাধ্যমে গুনাহ করেছেন, নিষিদ্ধ পাপ করেছেন।

২. হযরত মুসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের স্থলাভিষিক্ত ও খলিফা মনোনয়ন করাও অনুচিত ও অ-যথেষ্ট হয়েছে। কেননা মূল যিম্মাদার তো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন। হারুন আলাইহিস সালাম স্রেফ সহায়ক ও পরামর্শদাতা ছিলেন।

৩. হযরত মুসা আলাইহিস সালামের এই ভাবনা ও পদক্ষেপও অনুচিত হয়েছে যে, তিনি জামাত ও জাতির মুকাবিলায় কেন একাকীত্ব ও নির্জনবাসকে প্রাধান্য দিলেন!

৪. একাকীত্ব ও নির্জনবাসের অন্যতম পরিণতি হল, এর ফলে জাতির মাঝে গুমরাহি দেখা দেয়।

৫. বয়ানের অনিবার্য পরিণতিতে মানুষের মাঝে এ মানসিকতাও গড়ে উঠে যে, নির্জনবাস ও একাকীত্ব, অন্য ভাষায় বললে, 'আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়ার উদ্দেশ্যে নির্জনবাস অবলম্বন ও এতদুদ্দেশ্যে খানকাহর ব্যবস্থাপনা অনুপকারী, অপ্রয়োজনীয় বরং ক্ষতিকর।

৬. বয়ানের আরেকটি অনিবার্য পরিণতি হলো, সাধারণ শ্রোতামণ্ডলী যখন এ ঘটনা বর্ণনা করবেন তখন তারা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের এ পদক্ষেপকে ভুল অভিহিত করে তাঁর সম্পর্কে ঔদ্ধত্যমূলক শব্দ ব্যবহার করবেন।

যদি বাস্তবতা ও দলিল-দস্তাবেজের আলোকে আলোচিত বিষয়টি নিরীক্ষণ করা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে পরিত্যাজ্য হবে। কারণগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরছি–

প্রথম কথা

'ইসমতে আম্বিয়া' আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সর্বসম্মত বিশ্বাস। অর্থাৎ আমাদের অন্যতম আকিদা হলো, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম নিষ্পাপ। মুসা আলাইহিস সালাম বা অন্য কোনো নবি কখনো কোনো গুনাহ করেননি। যদি তাদের কারো থেকে এমন কোনো পদক্ষেপ প্রকাশ পায়, যা বাহ্যিকভাবে গুনাহ ও নিষিদ্ধ কাজ মনে হয় তাহলে বাস্তবে সেটা কোনো গুনাহ নয়। ওই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে তাকে মাযুর মনে করা হবে। এবং এমন পদক্ষেপের জন্যে তিনি সাওয়াব পাবেন। আর তাদের কারো থেকে যদি কখনো ইজতিহাদি বিভ্রম ঘটে, তাহলে এর বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংশোধন করা হতো।

দ্বিতীয় কথা

সাইয়্যেদুনা মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় প্রথম কথা হল, বাস্তবে তিনি স্বজাতিকে ছেড়ে একাকী বেরিয়ে পড়েছিলেন, না-কি একটি জামাত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে বিস্তর আলাপ আছে। কিছু মুফাসসির রহ. এর অভিমত হল, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজের খলিফা বা স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে স্বজাতি থেকে ৭০ জন বাছাই করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম কুরতুবি রহ. সবার আগে এ অভিমতটিকেই উদ্ধৃত করেছেন—

قيل عنى بالقوم جميع بني اسرائيل فعلى هذا قيل استخلف هارون على بني اسرائيل وخرج معه بسبعين رجلا للميقات. (قرطبي صـ ١٥٥، ج١١، سورة طه)

তৃতীয় কথা

দ্বিতীয়ত যদি এ কথা মেনেও নিই যে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বাস্তবেই স্বজাতিকে ছেড়ে নির্জন বাস গ্রহণ করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার আরো সন্তুষ্টি অর্জন করবেন। কিতাবের ভাষায়—

عجلت إليك رب لترضى، قال ابن كثير : أي لتزداد عني رضا. (ابن كثير : ٢١٧، ج: ٢)

তাহলে তাঁর সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই ভুল ছিল না। তাঁর পদ্ধতিও ভুল ছিল না। তাইতো দেখা যায়, ইমাম কুরতুবি রহ. এ ঘটনার এক পর্যায়ে এ কথাও খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন যে, ওই সময় হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আবেগের আতিশয্যে বড় বড় কদম ফেলে হেঁটে চলেছিলেন। তাঁর আবেগের চিত্র ফুটিয়ে তুলতে, উপমা ও সমর্থন হিসেবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঘটনাও তুলে ধরেছেন যে, তিনি শখ ও ভালোবাসার আতিশয্যে প্রথম বৃষ্টির পানিতে গোসল করতেন। এর পাশাপাশি তিনি আরো কিছু ঘটনা তুলে ধরে লিখেন—

{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} قال : شوقا. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا آوت إلى فراشها تقول : هاتوا المجيد. فتؤتى بالمصحف فتأخذه في صدرها وتنام معه تتسلى بذلك ؛ رواه سفيان عن معسر عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء خلع ثيابه وتجرد حتى يصيبه المطر ويقول : "إنه حديث عهد بربي" فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم وممن بعده من قبيل الشوق. (قرطبي، صـ ١٩٦، ج: ١١، طبع جديد)

তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, মুসা আলাইহিস সালামের সেই পদ্ধতি ভুল ছিল না। কেননা যদি তাঁর সেই পদক্ষেপ ইজতিহাদি ভুল হতো তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এর ওপর সতর্কবার্তা চলে আসতো; অথচ এমনটি হয়নি। আল্লাহ তাআলা ○ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى ধমকি ও সতর্ক বার্তা হিসেবে বলেননি। যদিও কিছু কিছু আলেম এ ধরনের অভিমত পেশ করেছেন; কিন্তু বাস্তবতা হলো, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের এই পদক্ষেপ কখনই ইজতিহাদি ভুল ছিল না। এবং আল্লাহ তাআলাও এ পদক্ষেপের ওপর কোনো শক্ত ভাষা বা সাবধান বাণী বলেননি। সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, মহান আল্লাহ ওই বাক্যটি বলেছিলেন ভালোবেসে, সম্মান জানিয়ে, হৃদয়ে সান্ত্বনার আবেশ ছড়িয়ে দিতে।

قال ابن عباس : كان الله عالما ولكن قال : {وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ} رحمة لموسى ، وإكراما له بهذا القول ، وتسكينا لقلبه ، ورقة عليه. (قرطبي، صـ : ١٥٥، جـ١١)

বাকি থাকল তাঁর এই মন্তব্য যে, বনি ইসরাঈলের গুমরাহ হওয়ার বিষয়টি। (এখানে তাদের যেই সংখ্যা তিনি বলেছিলেন যে, তারা ছিল ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার। প্রশ্ন থেকে যায়, এই সংখ্যা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত?) তাদের গুমরাহি ছিল সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর ইচ্ছায়। এটি তাকদিরি বিষয়। আল্লাহর অমোঘ বিধান। এতে বান্দার বিন্দু পরিমাণ ভূমিকা নেই। নবি বা সাধারণ উম্মাহ- প্রত্যেকেই পুরোপুরিভাবে শরিয়াত তথা মহান আল্লাহর বিধানের অনুগত। এখন কেউ যদি শরিয়াত পরিপন্থী কোনো কাজ না করে তাহলে কিছুতেই তাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। শরিয়াত পরিপন্থী কাজ না করলে কাউকে আল্লাহর কাছে পাকড়াও হতে হবে না। যদি কারো কোনো পদক্ষেপের কারণে গোটা পৃথিবী গুমরাহ হয়ে যায়; কিন্তু তার কাজটি শরিয়াত পরিপন্থী না হয়, তাহলে এর জন্যে তাকে কিছুতেই দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না।

চতুর্থ কথা

এ কথাও সঠিক নয় যে, 'হযরত মুসা আলাইহিস সালাম যেহেতু প্রধান ছিলেন আর হারুন আলাইহিস সালাম স্রেফ অংশিদার ও উপদেষ্টা ছিলেন। কাজেই মূল যিম্মাদার অর্থাৎ হযরত মুসা আলাইহিস সালামের অবস্থান করা আবশ্যক ছিল।' এ কথা বাস্তবতার পরিপন্থী। মেনে নেওয়ার মত নয়। হযরত হারুন আলাইহিস সালাম শুধু সহকারী ও শরিক-ই ছিলেন না, তিনি একজন নবিও ছিলেন। সেই ঘটনা-সহ আরো অনেকগুলো বিষয়বস্তুর অধীনে ইমাম কুরতুবি ও ইমাম ইবনে কাসির রহ. প্রমূখ মুফাসসির এ কথা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

فهارون، عليه السلام، نبي شريف كريم على الله، له وجاهة وجلالة. (قرطبي)

পঞ্চম কথা

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা-ও ভুল যে, 'হযরত মুসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে নিজ স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে নির্জনে চলে গিয়েছিলেন। এ কাজ তাঁর জন্যে সমীচীন হয়নি। এ কাজের কারণেই এতোগুলো মানুষ দ্বীন হারিয়েছে।' সাদ সাহেবের পুরো বয়ানের উদ্দেশ্য এটাই ছিল। অথচ তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য আদৌ সঠিক নয়। কেননা নিজ স্থানে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করাটা যে জায়েয, এর স্বপক্ষে এই ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারিমাহকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকেন। তাফসিরে কুরতুবিতে এসেছে—

وقال موسى حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها لأخيه هارون : كن خليفتي ؛ فدل على النيابة. (قرطبي، صـ١٧٦، ج: ٧)

এরপরও কেন এ পদক্ষেপকে ভুল বলা হবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু অভিযানে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে হযরত আলী রাদি.-কে নিজ স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে বলেছেন, 'যেভাবে মুসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে খলিফা বানিয়েছিলেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমিও তোমাকে (এ যুদ্ধে) আমার স্থলাভিষিক্ত বানাচ্ছি? পার্থক্য শুধু এখানে যে, আমার পর কেউ নবি হবে না।' মুসলিম শরিফের মাঝে বর্ণনাটি রয়েছে—

وقال موسى حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها لأخيه هارون : كن خليفتي ؛ فدل على النيابة. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي حين خلفه في بعض مغازيه : "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي" .

যদি এভাবে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করার পদক্ষেপটি ভুল হয়ে থাকে তাহলে কি 'নাউযুবিল্লাহ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরিউক্ত পদক্ষেপকেও ভুল বলা যাবে? কেননা

তিনি এভাবে স্থলাভিষিক্ত নির্বাচন করার স্বপক্ষে হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমুস সালামের খলিফা নির্বাচনের ঘটনাকে নজির ও উপমা হিসেবে পেশ করেছেন যে, যেভাবে তাঁরা করেছিলেন, সেভাবে আমিও করছি। কাজেই যদি মুসা আলাইহিস সালামের পদক্ষেপটি অসতর্ক ও অসমীচীন বা ভুল হয়ে থাকে তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরিউক্ত পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

ষষ্ঠ কথা

তর্কের খাতিরে যদি উপরের সবগুলো বিষয় মেনে নিই তখনও কোনো ঘটনাকে এভাবে বয়ান করা, যেখান থেকে এ ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, 'একাকীত্ব, নির্জন বাস, নিভৃত স্থানে অবস্থান, খানকাহে অবস্থান— এগুলোর কারণে মূল দায়িত্ব থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, বা কাজের প্রতি অবহেলা জন্মায়। বা এগুলো সম্পর্কে জনমনে এ মানসিকতা সৃষ্টি হয় যে, এগুলো ক্ষতিকর বা অনুপকারী। এই পদ্ধতি আদৌ সঠিক নয়। কেননা দাওয়াত ও তাবলীগের মত তাযকিয়াহ—আত্মশুদ্ধির মেহনতও নবিওয়ালা কাজ। এবং তা আবশ্যক কাজও বটে। বিভিন্ন আয়াতে এই তাযকিয়ার কথা এসেছে। يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم।

হ্যাঁ, এই তাযকিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। একাকীত্ব ও খানকাহি জীবনও এই তাযকিয়ার ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি। খায়রুল কুরুন বা ইসলামের সবচেয়ে সোনালী যুগ থেকে শুরু করে হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভি রহ. হযরত গাঙ্গুহি রহ. হযরত রায়পুরি রহ. হযরত থানভি রহ. প্রমুখ এই মেহনত করেছেন। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ. مولانا الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت (মাওলানা ইলয়াস রহ. ও তাঁর দ্বীনি দাওয়াত) গ্রন্থের ভূমিকায় এর ওপর বিশদ আলোচনা করেছেন। কাজেই এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা, যার ফলে দাওয়াত ও তাবলিগের মুকাবিলায় এই কাজের (যা বাস্তবেই নবিওয়ালা কাজ) অবমূল্যায়ন হয়, যারা এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত— তাদের প্রতি মানুষের মনে অবজ্ঞা ও দূরত্ব জন্ম নয়ে। যদি কেউ এমনটি করে তাহলে সেটা হবে বেদ্বীনি কাজ। সেটা হবে হতাশাজনক পদক্ষেপ। অনতিবিলম্বে তা পরিত্যাগ করা দরকার। শুধু তাই নয়, তার সেই কাজ হবে এই তাবলিগি মেহনতের প্রথম প্রবর্তকের স্পষ্ট নির্দেশনার সুস্পষ্ট লংঘন।

কেননা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এর মালফুযাত (বাণীসমষ্টি) ও মাকতুবাত (পত্রাবলি) এর মাঝে এ আলোচনা বারংবার উঠে এসেছে যে, 'আহলুল্লাহ, মাশায়েখ ও খানকাহনিবাসী বুর্যর্গদের সঙ্গে নিবীড় সম্পর্ক রাখতে হবে। তাঁদের সংস্পর্শে যেতে হবে। তাঁদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের কাছ থেকে যিকির শিখতে হবে। মেওয়াতের সাথী ভাই (তাবলীগের খাওয়াস) দের উদ্দেশে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. একটি বিশেষ চিঠিতে লিখেছিলেন,

১. "কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাচ্ছি।" (এ কথা বলে তিনি পনেরোটি হিদায়াতি কথা বলেন, যা সকল তাবলিগি ভাইদের জন্যে অতিগুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ও পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে)।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. লিখেন,

> 'তাবলিগের যেসকল সদস্য কোনো শায়খের বাইআতাবদ্ধ এবং বাইআত হওয়ার পর তাদেরকে যিকিরের যে আমল দেওয়া হয়েছে, তারা তা পালন করছে, কি করছে না? যাদেরকে বারো তাসবিহের আমল দেওয়া হয়েছে, তারা তা নিয়মিত আদায় করছে, কি করছে না? যারা বারো তাসবিহের যিকির করছে তাদেরকে এর ওপর উদ্বুদ্ধ করো যে, তারা যেন রায়পুর গিয়ে (হযরত মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি সাহেব রহ. এর খেদমতে থেকে, তাঁর খানকাহে) একেক চিল্লা অতিবাহিত করে।"
>
> [মাকাতিবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.। পৃষ্ঠা- ১৩৭। সংকলক- মাওলানা আবুল হাসান আলি নদভি]

২. মালফুযাতের মাঝে তিনি বলেছেন—

> 'এটাও আবশ্যক যে, ইলম ও যিকিরের মাঝে এই নিমগ্নতা এ পথের বড়দের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এবং তাদের নির্দেশনা ও পৃষ্ঠপোষকতার অধীনে হবে। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ইলম ও যিকির সম্পন্ন হতো মহান আল্লাহর নির্দেশনার অধীনে। সাহাবায়ে কেরাম ইলম ও যিকির গ্রহণ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে। তিনি তাঁদের পূর্ণ

দেখাশুনা করতেন। এভাবে প্রতিটি যুগের মানুষ তাদের বড়দের কাছ থেকে ইলম ও যিকির গ্রহণ করেছেন। তাঁদের তত্ত্বাবধান ও পর্থনির্দেশনায় সম্পন্ন করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আজো আমরা আমাদের বড় ও (মাশায়েখের) পৃষ্ঠপোষকতার মুখাপেক্ষী। নয়তো শয়তানের জালে ফেঁসে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।"

[মালফুযাতে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.। পৃষ্ঠা– ১১১]

৩. অন্য এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

'আমার মতে এই মেহনত চালিয়ে নেওয়ার জন্যে এ সময় আবশ্যক হল, মাশায়েখে তরিকত, উলামায়ে শরিয়ত ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ– এমন কয়েকজন হযরতকে নিয়ে একটি জামাত গঠন করে তাঁদের পরামর্শের অধীনে এই কাজ পরিচালিত হওয়া দরকার। যেভাবেই হোক, শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রয়োজন অনুসারে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার। যাবতীয় ব্যবহারিক বিষয়াবলি এর অধীনে নিষ্পন্ন হবে। কাজেই এ ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

[মাকাতিবে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ.। পৃষ্ঠা– ১৪৪]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর উপরিউক্ত মহামূল্যবান নসিহতের পর এখন আর এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, 'একাকীত্ব ও নির্জনতা অবলম্বন, নিভৃত স্থানে দিন গুজরান এবং খানকাহি ব্যবস্থাপনা অনুপকারী ও অনাবশ্যক বা ক্ষতিকর। বিশেষকরে যখন হযরত মাওলানা ইলয়াস সাহেব রহ. নিজেই এর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করার তাগাদা দিয়েছেন এবং পুরো তাবলিগি নিযামকে এ ধরনের উপদেষ্টামণ্ডলীর অধীনে, সরাসরি তত্ত্বাবধানে চলার নসিহত করেছেন, অসিয়ত করেছেন এবং এ ধরনের পরামর্শসভা আয়োজন করার ওপর জোর দিয়েছেন, যেই উপদেষ্ঠা পরিষদ গঠিত হবে মাশায়েখে তরিকত, উলামায়ে শরিয়ত ও রাজনীতি সম্পর্কে প্রাজ্ঞ মনীষীদের সমন্বয়ে।

কাজেই পুরো চিত্র সামনে রেখে আপনার এ মন্তব্য গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে,

خلوت وعزلت گاجذبہ ہو گاتولوگوں کو اپنے سے جوڑنے کا جذبہ ہوگا،اور دعوت کے کام میں لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا جذبہ پیدا ہوگا،اور خلوت اور گوشہ نشینی کے اختیار کرنے کے نتیجہ میں گمراہی اور ارتداد وخروج میں آتا ہے.

'যদি নিজের মাঝে একাকীত্ব ও নির্জনবাসের জযবা উথলে উঠে তাহলে লোকদেরকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করার জযবা সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে লোকদেরকে আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত করার জযবা সৃষ্টি হবে। একাকীত্ব ও নির্জনবাস অবলম্বন করার পরিণতিতে গুমরাহি ও ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটে।'

উদ্বেগের বিষয় হল, এ কথার প্রভাব মাশায়েখ-বুযুর্গানে দ্বীন থেকে শুরু করে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম পর্যন্ত পৌঁছে। শুধু তাই নয়, এ ধরনের আলোচনার কারণে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর হিদায়াত পরিপন্থী মানসিকতাও গড়ে উঠবে।

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতে অবহেলার কারণে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়েছিল’ এ কথা কি সঠিক?

আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও এক্ষেত্রে অবহেলা করা হলে কী ক্ষতি হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন, ‘দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে অবহেলা করার পরিণতিতে ইরতিদাদ তথা ধর্মত্যাগ ছড়িয়ে পড়ে।’ এ কথাকে দৃঢ় ও প্রমাণসিদ্ধ করার জন্যে আপনি স্পষ্টভাবে পূর্ণ আস্থা সহকারে বলেছিলেন যে,

> دعوت کا چھوٹ جانا ارتداد کا سبب ہے، مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد آگیا، نبی گئے، دعوت گئی، دین گیا، ارتداد آیا، پھر دعوت آئی اور جماعتیں جہاں جہاں روانہ ہوئیں، اسامہ کا لشکر جہاں جہاں گیا لوگ اسلام میں واپس آتے گئے۔
>
> দাওয়াত ছুটে যাওয়া ইরতিদাদের কারণ। মদিনা মুনাওয়ারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর ইরতিদাদ চলে আসে। নবি বিদায় নিয়েছেন, দাওয়াত বিদায় নিয়েছে, দ্বীন বিদায় নিয়েছে, ইরতিদাদ চলে এসেছে। এরপর যখন দাওয়াত ফিরে আসে এবং বিভিন্ন স্থানে জামাত রওয়ানা হয়, উসামা রাদি. এর বাহিনী যেখানে যেখানে যায় মানুষ ইসলামে ফিরে আসতে থাকে।

আপনার বিবৃত এই বাক্য ‘নবি বিদায় নিয়েছেন, দাওয়াত বিদায় নিয়েছে, দ্বীন বিদায় নিয়েছে, ইরতিদাদ চলে এসেছে’ খুবই আপত্তিকর। যদি কথাটিকে শুদ্ধ ধরে নেওয়া হয় তাহলে নির্ঘাত এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, ‘নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর খোদা না খাস্তা সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশিদিন রাযি.-ও দাওয়াত ও তাবলীগের গুরু দায়িত্ব পালনের

ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন। এই অবহেলা যে ধরনেরই হোক, আর যতটুকু সময়ের জন্যেই হোক, এর কারণেই ইরতিদাদের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। বলুন, আপনার এই মন্তব্যের কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাদি. এর ওপর কতটা মারাত্মক অপবাদ আরোপিত হয়, তা আপনিই নিরুপণ করুন। শুধু সাহাবায়ে কেরাম রাদি.-ই নন, খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও আঙুল তোলা হচ্ছে যে, –আল্লাহ না করুন– তিনি তাঁর পর এমন খলিফা ও স্থলাভিষিক্তদের রেখে গেছেন, যাদেরকে আনুগত্য করার নির্দেশ খোদ তিনিই দিয়েছিলেন। যেই খলিফাদের ওপর আস্থা রেখে তিনি ‘— عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين তোমাদের অবধারিত দায়িত্ব হল, তোমরা আমার সুন্নত ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নত অনুসরণ করবে’ বলে পুরো উম্মতকে আনুগত্য করার জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ –খোদা না খাস্তা– তারাই এতটা অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেই তাঁরা দাওয়াত ও তাবলীগের মত অতিগুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা শুরু করে দিয়েছিলেন। নবির বিদায়ের সাথে সাথে দাওয়াতের কাজও বিদায় নেয়। যার পরিণতিতে ইরতিদাদ তথা ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়।

‘— نبی گئے، دعوت گئی নবির বিদায়ের সাথে সাথে দাওয়াতও বিদায় নিয়েছে’ বলুন, সেই দাওয়াত কোনটি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন; কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদিন সেখানে অবহেলা করেছেন? সহিহ মুসলিম গ্রন্থের ‘ঈমান অধ্যায়ে’ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদি. থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু একান্ত সঙ্গী, সহযোগী আনসার দিয়ে থাকেন, যাঁরা সেই নবির সুন্নত দৃঢ়তার সঙ্গে আকড়ে ধরেন। তাঁর নির্দেশাবলির অনুসরণ করেন। কিন্তু এরপর সেই একান্ত সঙ্গীদের এমন কিছু উত্তরাধিকারী জন্ম নেয়, যাদের অবস্থা হল, ‘يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون–যারা এমন কথা বলে বেড়ায়, যার ওপর তারা নিজেরাই আমল করে না। আবার এমন আমল করে বেড়ায়, যার নির্দেশ তাদেরকে করা হয়নি’। এরপর সেই লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ওপর উদ্বুদ্ধ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن—'যারা স্বহস্তে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে তারাই মুমিন'। [মুসলিম শরিফ, ফাতহুল মুহিম, পৃষ্ঠা- ৬০৬, খণ্ড- ১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সঙ্গী কে? সর্বাধিক প্রিয় সহচর কারা? বলুন, তাঁদের সম্পর্কে কি কখনো এ কথা কল্পনা করা সম্ভব যে, প্রিয়নবির ইনতিকালের পর তাঁরা দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন? যদি এ কথা সত্য মেনে নিই তখন তো কেউ এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে যে, তারাই সেই অযোগ্য খলিফা- যাঁদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ হাদিসে এসেছে। নাউযুবিল্লাহ, কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়?!

এ কথা সঠিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর ইরতিদাদের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন হল, এই যে ধর্মত্যাগের হিড়িক- এটা কি সবসময় দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে অবহেলা করার কারণে দেখা দেয়? যদি তেমনটাই হয়ে থাকে তাহলে নাউযুবিল্লাহ, কেউ তো এ কথা বলারও দুঃসাহস দেখাতে পারে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উরায়নাহ গোত্রের কিছু সদস্য মদিনা নগরীতে এসে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। তারা এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে মদিনার বাইরে অবস্থানরত দুজন রাখালের কাছে তাদের পাঠিয়ে দেন এবং সেখানে গিয়ে দুধ ইত্যাদি খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা সেখানে চলে যায়। কিছু দিন পর তারা সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর এক পর্যায়ে তারা মুরতাদ হয়ে যায় এবং রাখালদের হত্যা করে পলায়ণ করে। পুরো ঘটনা হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। [তিরমিযি শরিফ, পৃষ্ঠা- ১১, (باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه)

এখন এ ঘটনাতেও কি আপনি বলবেন যে, উরাইনাহ গোত্রের এই লোকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবহেলা করেছিলেন, তাদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত সুষ্ঠুভাবে আদায় করেননি!? যার পরিণতিতে তারা মুরতাদ হয়ে যায়। আল-ইয়াযু বিল্লাহ।

আমাদের মনে রাখা দরকার, লোকদের দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা অথবা ইসলাম ত্যাগ করা, উম্মতির উন্নতি অথবা অধঃপতন, একের পর এক মসজিদ মাদরাসার প্রতিষ্ঠা বা বিনাশ, মুসলিম উম্মাহর জান-মালের

সংরক্ষণ অথবা গণহত্যা— এগুলোর সবই মহান আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অনুসারে ঘটে থাকে। এ সব ঘটনার জন্যে বান্দাদেরকে পাকড়াও করা হবে, কি হবে না, এক্ষেত্রে কাউকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে, কি হবে না, তার জন্যে অবশ্যই শারঈ দলিল-দস্তাবেজ লাগবে। শরিয়ত তাদেরকে যেই বিধান দিয়েছে, যেই নির্দেশনা অবহিত করেছে, যদি সেখানে তারা অবহেলা করে তাহলে আল্লাহর আদালতে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ডিত হবে। নয়তো নয়।

এখন পৃথিবীর কোথাও যদি কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তন ইরতিদাদধর্মী হোক, বা অন্য কোনো ধরনের হোক, যদি বাস্তবেই তা শরিয়তের বিধানাবলির ওপর আমল না করার পরিণতিতে ঘটে থাকে তাহলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হব। নয়তো অপরাধী বিবেচিত হব না। এটাই শরিয়তের চিরন্তন বিধান। এই বিধান যেমন নবিদের বেলায় প্রজোয্য, তেমনই সাধারণ উম্মাহর ক্ষেত্রেও প্রজোয্য। نبی گئے، دعوت گئی —'নবির বিদায়ের সাথে সাথে দাওয়াতও বিদায় নিয়েছে'... এ কথাটি খুবই আপত্তিকর। প্রশ্ন উঠে যে, ইরতিদাদ কি শারঈ বিষয়াবলির ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে ঘটেছে, না-কি তাকদিরি সিদ্ধান্তের ফলে ঘটেছে? কিন্তু আপনি যখন অকপটে বলে ফেললেন যে, 'নবি বিদায় নিয়েছেন। নবির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াতও বিদায় নিয়েছে।' তখন পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় যে, খুলাফায়ে রাশেদিন ও বড় বড় সাহাবি রাযি. এর দাওয়াতি কাজ না করার কারণে ইরতিদাদ দেখা দিয়েছে। আপনার এই দাবির পক্ষে প্রমাণ কী? আপনি কোন দলিলে প্রমাণিত করবেন যে, খুলাফায়ে রাশেদিন দাওয়াতের মেহনতে অবহেলা করেছেন? আপনার এ কথা সাহাবায়ে কেরাম ও খুলাফায়ে রাশেদিনের ওপর মারাত্মক অপবাদ।

আপনি এ কথাগুলো বলেছেন লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে। যারা আপনার বয়ান তন্ময় হয়ে শুনছিল। এখন এই শ্রোতারাও তো এ বয়ান আপনার শেখানো শব্দে নকল করতে শুরু করবে। যা সরাসরি সাহাবায়ে কেরাম রাদি. ও খুলাফায়ে রাশেদিনের ওপর অপবাদ ছুড়ে দেয়।

আপনি যখন এধরনের কথা বলবেন তখন আপনার দেখাদেখি অপরাপর দায়িত্বশীল হযরাতও এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কথা বলতে শুরু করবে। কারণ, যিম্মাদারের প্রভাব অধীনস্থদের ওপর পড়ে থাকে।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, কয়েক বছর পূর্বের কথা। মারকাযেরর এক বড় যিম্মাদার লাখনৌ মারকাযে আগমন করতেন। সেখানে বয়ান করতেন। এ ধরনের এক বয়ানে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই যিম্মাদার হযরত মাগরিব পরবর্তী বয়ানে দাওয়াত ও তাবলীগের গুরুত্ব ও এক্ষেত্রে অবহেলার পরিণতি সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন—

خلفاء راشدین کے بعد سے امت نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو کوتاہی کی ہے اس کا خسارہ و خمیازہ امت کو بھگتنا پڑا ہے، اور اس سے جو نقصانات ہوئے ہیں آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی.

> খুলাফায়ে রাশেদিনের পর থেকে উম্মত দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে যেই অবহেলা করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষতিকর উম্মতকে ভোগ করতে হচ্ছে। এর ফলে যেই ক্ষতিগুলো হয়েছে, আজ পর্যন্ত তা পূরণ হয়নি।'

তিনি তার বক্তব্যে দাবি করেছেন— খুলাফায়ে রাশেদিনের পর থেকে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে অবহেলা হয়েছে। অবহেলার এই দাবি সকল তাবেঈ, মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ ইমামকে অভিযুক্ত করে। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল আযিয রহ. হাসান বসরি রহ. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সবাই অপরাধের কাঠগড়ায় উঠে আসছেন। উপরে এ ধরনের বয়ানের যেসব ক্ষতিকর প্রভাবের কথা বলেছি, সেগুলো এখানেও চলে আসে। আমার তখন ফেরার তাড়া ছিল। এজন্যে কয়েকজন ছাত্রকে বিষয়টি বুঝিয়ে ওই যিম্মাদার সাহেবের কাছে পাঠাই। তারা যখন আপত্তিগুলো তাকে বুঝিয়ে দেয় তখন তিনি বুঝতে পেরে সতর্ক হন এবং ফজর পরবর্তী বয়ানে ওযরধর্মী শব্দে এ কথা ব্যাখ্যা করেন যে, 'আমার এমন উদ্দেশ্য ছিল না'। কিন্তু সমস্যা হল, মাগরিব পরবর্তী বয়ানে বিশাল যেই জনগোষ্ঠী এ ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত বয়ান শুনে বাড়ি ফিরে গেছে, তারা তো কথাগুলো শিখে চলে গেছে। এখন তারা সব জায়গায় ওই শব্দেই কথাগুলো নকল করতে থাকবে। ওই সময়ের বয়ানের ফলে যেই ক্ষতিগুলো হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে এখন পর্যন্ত তার ক্ষতিপূরণ হয়নি। আপনার এ ধরনের বয়ানের কারণে সাধারণ জনগণের যেই মন-মানসিকতা গড়ে উঠছে, তার প্রায়শ্চিত্ত আপনাকেই করতে হবে।

কিছু বিষয় আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি

১. সুন্নতের প্রকারভেদ

সবশেষে আপনার সঙ্গে একটি জ্ঞানধর্মী আলোচনা সেরে নিতে চাচ্ছি। আপনি আপনার বয়ানে 'সুন্নত তিন প্রকার' বলেছেন। এক. সুন্নতে ইবাদত। দুই. সুন্নতে দাওয়াত। তিন. সুন্নতে আদত। এরপর সুন্নতে আদতের অধীনে উদাহরণ হিসেবে আপনি মিসওয়াকের কথা উল্লেখ করেছেন। একথা আপনি আজমগড়ের ইজতিমায় আলেমদের খুসুসি বয়ানেও বলেছিলেন, হাতুড়ার ইজতিমায় আম বয়ানেও বলেছিলেন।

আমি শুধু জানার জন্যে বলছি যে, আপনি যেভাবে সুন্নতের ভাগ ও ব্যাখ্যা করলেন, এর উৎস কী? এটি কি আপনার উদ্ভাবিত নতুন পরিভাষা, না কারো কাছ থেকে সংগৃহীত? সাধারণত ফুকাহায়ে কেরাম ও উসুলবিদগণ সুন্নতের দুটি প্রকারের কথা বলে থাকেন। সুন্নতে ইবাদত ও সুন্নতে আদত। কেউ কেউ একে 'সুনানে হুদা ও সুনানে যাওয়ায়েদ' শব্দে ব্যক্ত করে থাকেন। আপনি সুন্নাতে আদত পালন করার ওপরও বেশ জোর দিয়েছেন এবং সুন্নাতে আদতের উদাহরণ হিসেবে মিসওয়াকের কথাও উল্লেখ করেছেন। আপনার এ কথা বুঝে আসেনি। সুন্নতের প্রকারভেদ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা উসুলের কিতাবগুলো যেমন, নুরুল আনওয়ার, হুসামি প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।

ইমদাদুল ফাতাওয়ার মাঝে হাকিমুল উম্মাহ মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. লিখেছেন,

সুন্নত দু' প্রকার। সুন্নতে ইবাদত, সুন্নতে আদত। সাধারণত সুন্নত শব্দ সুন্নতে ইবাদতের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের সুন্নত পালন করলে সাওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে। এবং এগুলোর ওপর উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের সুন্নত, অর্থাৎ সুন্নাতে আদতও বরকতশূন্য নয়। এগুলো ভালোবাসার দলিল। কিন্তু এগুলো দ্বীনের মূল লক্ষ্যের অংশ নয়। যার কারণে দেখা যায় যে, যদি এগুলোর কোনোটির কারণে দ্বীনের মূল লক্ষ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তখন এগুলো থেকে নিষেধ করা হয়ে থাকে।' [ইমদাদুল ফাতাওয়া, পৃষ্ঠা– ২২৯, খণ্ড– ৪]

আপনি সুন্নতের যেই প্রকারভেদ ও বিন্যাস উদাহরণ সহকারে পেশ করেছেন, সেগুলোর উৎস ও দলিল জানতে চাচ্ছি।

২. বিলায়াতের পথ কি নবুওয়াতের পথ নয়!

তদ্রূপ আমি শুধু জানার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করছি যে, আপনি আপনার কিছু কিছু বয়ানে বিলায়াতের পথ ও নবুওয়াতের পথের মাঝে সংক্ষিপ্ত ফারাকের কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে ফারাক নয়; বরং আপনি শুধু ভাগ করেছেন। এ কথাও বলেছেন যে, দাওয়াতের পথ হল নবুওয়াতের পথ। বিলায়াতের পথের ওপর নবুওয়াতের পথ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব পাবে। কিন্তু আপনি বিলায়াতের পথের সঙ্গে নবুওয়াতের পথের পার্থক্যের কথা স্পষ্ট করেননি। এ দু'টির মাণদণ্ড কী? উভয় পথের মাঝে বুনিয়াদি পার্থক্য কী? অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তাকারে বলার কারণে মানুষ ভুল বুঝাবুঝির স্বীকার হচ্ছে। সাধারণত এ ধরনের বয়ানের কারণে মানুষ মনে করছে যে, বিলায়েত হচ্ছে সুফিদের তরিকা। তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির তরিকা। খানকায় মাশায়েখগণ যে পদ্ধতিতে তরবিয়াত দিয়ে থাকে, সেটাই বিলায়াতের তরিকা। এর বিপরীতে খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ অর্থাৎ হেঁটে হেঁটে দাওয়াত দেওয়া, এটা হচ্ছে নবুওয়াতের তরিকা। এই অস্পষ্ট সংক্ষিপ্ত বয়ানের কারণে লোকদের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছে। আমার কৌতূহল হলো, এটাও কি আপনার নিজস্ব পরিভাষা, না-কি হাদীসের ব্যাখ্যাকার মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও উসুলবিদ ফুকাহায়ে কেরামের কারো থেকে সংগ্রহ করেছেন? এর বিবরণ, উৎস ও দলিল জানতে চাচ্ছি। সাথে সাথে এ দুটোর মাঝে পার্থক্য কী এব তার বুনিয়াদ কী, সেটাও জানতি চাচ্ছি। অথচ কুরআন ও হাদিস থেকে বুঝে আসে যে, বিলায়াতের পথ ও দাওয়াতের পথ– উভয়টিই নবুওয়াতের পদ্ধতির মাঝে অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.-ও তাঁর প্রবন্ধের মাঝে বিষয়টি স্পষ্টাকারে তুলে ধরেছেন। কুরআন ও হাদিস থেকে তো এ কথাই বুঝে আসে যে, বিলায়াতের পথ ও নবুওয়াতের পথ আলাদা নয়। সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম রাদি. দাওয়াতও দিতেন, আবার আত্মশুদ্ধির কাজও আঞ্জাম দিতেন। দুটোই নবিওয়ালা কাজ। দাওয়াতের কাজটিও নবিওয়ালা মেহনত, তাযকিয়া, ইহসান ও আত্মশুদ্ধিও নবিওয়ালা মেহনত। বিলায়াতের পদ্ধতি দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, খানকায় বা অন্য কোনো স্থানে বসে মানুষের অন্তর ও আত্মা পরিশুদ্ধ করা তাহলে এটাও নবুওয়াতের পথ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন। তাঁর কাছে একের পর এক প্রতিনিধিদল এসে দ্বীন শিখে যেত। সাহাবায়ে কেরাম রাদি. নিজ আধ্যাত্মিক ব্যাধির কথা নিবেদন করে নিরাময়ের পথ্য জানতে চাইতেন। কেউ এসে বলত, হুজুর, ব্যাভিচার করার ইচ্ছে হচ্ছে। কেউ এসে অভিযোগ করত, হুজুর, মনের ভেতর কুমন্ত্রণা ও খারাপ ইচ্ছে

প্রচুর পরিমাণে জেগে উঠে! কেউ এসে নিফাকের অভিযোগ করত। কেউ এসে অন্তরের দুরাবস্থার কথা বলত। কেউ উপদেশ প্রার্থনা করত। কেউ এসে যিকিরের কথা জিজ্ঞেস করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেককে তাঁর অবস্থা অনুসারে জবাব দিতেন। সংশোধন করতেন। নসিহতও করতেন। যিকিরের কথা বলতেন। কেউ এসে নামাযের সময় জানতে চাইত। কেউ অন্য কোনো মাসআলা জানতে চাইত। তিনি প্রত্যেকের কৌতূহল মিটিয়ে দিতেন। এই কাজটাই যদি আউলিয়ায়ে কেরাম, মাশায়েখে দ্বীন ও মুফতিয়ানে কিরাম নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করে আঞ্জাম দেন তাহলে অব্যশই সেটা নবুওয়াতের উত্তরাধিকার। এই কাজগুলোকে নবুওয়াতের প্রতিপক্ষ বা বিপরীত বিষয় ঠাওরানো কতটুকু সঠিক? আশা করি, এ বিষয়ে আমাদেরকে আশ্বস্ত করার সুযোগ দেবেন।

৩. তাবলীগি নেসাবের বাইরের বই কি পড়া যাবে না!?

আপনি হাতুড়া বান্ধার ইজতিমায় সকালের বয়ানে এ কথা বলেছেন যে, 'এখন আমাদের অধ্যয়নে এমন সব কিতাব চলে এসেছে বা এমন কিতাবাদি পড়ার মানসিকতা আমাদের গড়ে উঠেছে যেগুলোর সঙ্গে দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনার অধ্যয়ন সীমিত রাখুন। হযরতজি রহ. এর বয়ান, মাওলানা ইলয়াস রহ. এর মালফুযাত, ফাযায়েলের বিভিন্ন কিতাব, হায়াতুস সাহাবাহ ও সীরাতের ক্ষেত্রে 'উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'– এ গ্রন্থগুলোর মাঝে নিজ অধ্যয়ন সীমিত রাখুন। এর বাইরের বইগুলো যদি পড়েন তাহলে কাজের স্তর নিচে নেমে যাবে। কাজের সাথীদের পত্র-পত্রিকা পড়া উচিত নয়। কেননা পত্রিকা পড়লে ক্ষমতার সঙ্গে বিশ্বাস সৃষ্টি হবে'। এর ধারাবাহিকতায় আপনি এ কথাও বলেছেন যে, 'আহকামের ইলম অর্জন করা উদ্দেশ্য নয়; কেননা ইলম এলে তো ফারেগ হয়ে যাবেন। ঈমান ও ইয়াকিনের এই মেহনতে ফারাগত নেই। এই কাজ জীবনভর করতে হবে।'

আপনার এই উচ্চমার্গীয় বয়ানের ব্যাখ্যা আমাদের তাবলীগি ভাইয়েরা এভাবে বুঝেছেন যে, 'যারা দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের সঙ্গে জড়িত তারা স্রেফ এই কিতাবগুলোই পড়বেন। এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত থাকবেন। এর বাইরের কিতাবাদি যদি পড়া শুরু করে দাও তাহলে তা তোমাদের এই তাবলীগি কাজের জন্যে ক্ষতি বয়ে আনবে। এর ফলে কাজের স্তরে ধস নেমে আসবে। আপনার এই অতিগুরুত্বব্যঞ্জক নসিহত সামনে থাকার

কারণে গোটা তাবলীগি হলকার মাঝে উল্লেখিত ইলমি ও ইসলাহি কিতাবাদির বাইরে অন্য এমন কোনো কিতাব অধ্যয়নকে প্রয়োজন মনে করা হয় না, যেগুলোর মাঝে কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট শিক্ষা ও বিধান আলোচিত হয়েছে। বরং সেগুলোকে মেহনতের প্রতিবন্ধক মনে করা হয়। বর্তমানে তাবলীগের সাথীদের এমন মানসিকতাই গড়ে উঠেছে ও উঠছে যে, তারা কয়েকটি তাবলীগি কিতাব ব্যতিরেকে অন্য সব দ্বীনি কিতাব থেকে নিজেদের অমুখাপেক্ষী মনে করছে। অথচ এ ধরনের কথাবার্তা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস সাহেব রহ. এর ফরমান অনুসারে দাওয়াত ও তাবলীগের বুনিয়াদি উদ্দেশ্য ও স্পষ্ট নির্দেশনারও পরিপন্থী। কেননা হযরত মাওলানা রহ. তাঁর মালফুযাত (অমীয় বাণী) ও মাকতুবাত (চিঠিপত্র) এর মাঝে বারবার এ কথা বলেছেন যে,

ہمارے کام کا مقصد ذکر، تعلیم و تبلیغ ہے.

'আমাদের মেহনতের উদ্দেশ্য যিকির, শিক্ষা ও তাবলীগ।'

[মাকাতিব : ১৩৮]

এ কথা ধ্রুব সত্য যে, দ্বীনি শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ইলম নিয়ে আগমন করেছেন, তার সীমারেখা ব্যাপক বিস্তৃত। মানবজীবনের প্রতিটি শাখা এ শিক্ষার আওতাভুক্ত। প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনি শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত বিশুদ্ধ ইলম স্রেফ ওই কিতাবগুলো পড়ে অর্জিত হবে না, যেগুলোকে আপনি চিহ্নিত করেছেন। যার কারণে অবশ্যই অন্যান্য কিতাব পড়তে হবে, অথবা উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে সরাসরি ফতোয়া-মাসাইল জেনে নিতে হবে। অর্থাৎ কিতাবাদি অধ্যয়ন ও সেগুলো থেকে উপকার গ্রহণ তা'লিমে দ্বীনেরই মাধ্যম, যা ব্যতিরেকে আমাদের তাবলীগের লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারে না। এর মাধ্যমে মেহনতের স্তর নিচের দিকে ধসবে না, বরং উপরের দিকে উন্নীত হবে, পূর্ণতা পাবে। হ্যাঁ, আমি কোন লেখকের বই পড়ব, কোন বই পড়ব, তা নিয়ে দ্বিধা-সংশয় হতে পারে। বিষয়টিকে মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

'হযরত মাওলানা থানভি রহ. অনেক বড় কীর্তি আঞ্জাম দিয়েছেন। আমি মনে-প্রাণে কামনা করি যে, 'তালিম হবে তাঁর, আর তাবলীগের তরিকা হবে আমার।' এভাবে তাঁর তালিম-শিক্ষা সমাজে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়বে। হযরত মাওলানা থানভি রহ. এর লোকদেরকে আমি অনেক বেশি সম্মান করি।' [মালফুযাতে মাওলানা ইলয়াস রহ. : ৫৮]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. তাবলীগি সাথীদের জন্যে একটি নিসাব-পাঠ্যক্রম তৈরি করা এবং এর জন্যে আলেমদের সঙ্গে মাশওয়ারা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। এমনকি তাবলীগি ভাইদের জন্যে কিছু কিতাব, বিশেষত হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা থানভি রহ. এর কিতাবগুলো নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। এ কথাও বলেছিলেন যে, 'হযরত থানভি রহ. এর এই কিতাবগুলো একাকী পড়া যথেষ্ট নয়; বরং সবাই একত্র হয়ে অন্যকে শোনানোও আবশ্যক। সেমতে তিনি তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেন,

'ইলমের ক্ষেত্রে আমার একান্ত বাসনা হল, তাবলীগ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে একটি নিসাব নির্ধারণ করা হোক। এক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতির জন্যে আপনার মত আহলে ইলমের সহযোগিতা কামনা করছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আমি পাঁচটি কিতাবের নাম প্রস্তাব করছি-

১. জাযাউল আমল (হযরত থানভি রহ.
২. রাহে নাজাত
৩. ফাযায়েলে নামায
৪. হিকায়াতে সাহাবা
৫. চেহেল হাদিস (মৌলভি শাইখুল হাদিস যাকারিয়া)

এ কিতাবগুলো একাকী পড়া আর সবার সামনে পড়ে শোনানো- উভয়টিই মেহনতের স্বতন্ত্র অংশ। শুধু একাকী পড়ার দ্বারা সবার সামনে পড়ে শোনানোর বরকত বয়ে আনবে না। তদ্রূপ সবার সামনে পড়ার দ্বারা একাকী পড়ার নূর বয়ে আনবে না। [মাকাতিব : ২৮]

অন্য এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

'আমার মন চাচ্ছে, এমন এক নিসাব নির্ধারিত হোক, যা প্রত্যেক ব্যক্তির রগ-রন্ধ্রে মিশে যাবে। আমার ইচ্ছে হল, ব্যক্তি যদি শিক্ষিত হয় তাহলে প্রথমে সে একাকী পড়বে। এরপর তা অন্যদের শোনাবে। সেখানে যেসব আমলের কথা থাকবে, প্রথমত তার ওপর নিজে শক্তভাবে আমল করার চেষ্টা করবে এবং সমাজে ছড়িয়ে দেবে।' (এ কথা বলে তিনি উপরিউক্ত কিতাবগুলোর নাম লেখেন)। [মাকাতিব : ৯২]

এক চিঠিতে মাওলানা ইলয়াস রহ. তাবলীগের সাথীদের উদ্দেশে পনেরোটি নসিহত করেন। সেখানে ৯ম উপদেশ ছিল,

> 'হযরত থানভি রহ. থেকে উপকৃত হতে হলে আবশ্যক হল, তাকে ভালোবাসবে। তাঁর সাথী-সঙ্গীদের সংস্পর্শে গিয়ে ও তাঁর রচনাবলি পড়ে উপকৃত হবে। তাঁর কিতাবগুলো পড়লে ইলম আসবে। আর তাঁর সঙ্গীদের কাছে গেলে আমল আসবে।' [মাকাতিব : ১৩৮]

হযরত ইলয়াস রহ. এর মালফুযাতের মাঝে আছে,

> আমি একান্তভাবে কামনা করি যে, 'তালিম হবে তাঁর (হযরত থানভি রহ. এর), আর তাবলীগের তরিকা হবে আমার।' এভাবে তাঁর তালিম-শিক্ষা সমাজে ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়বে।' [মালফুযাতে মাওলানা ইলয়াস রহ. : ৫৮]

হযরত থানভি রহ. এর ইনতিকালের পর হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, 'আমার ঐকান্তিক ইচ্ছে হল, বর্তমানে পুরো গুরুত্বের সঙ্গে এ কথা সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হোক যে, হযরত থানভি রহ. এর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করা, হযরতের বারাকাত থেকে উপকার গ্রহণ করা, পাশাপাশি হযরতের পরকালীন মর্যাদার স্তর উচ্চকিত করার প্রয়াসে অংশ নেওয়া এবং হযরতের রূহের আনন্দ বাড়ানোর সবচেয়ে উত্তম ও সুদৃঢ় মাধ্যম হলো, হযরতের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও নির্দেশনাবলি (যা তাঁর রচনাবলির মাঝে সংরক্ষিত রয়েছে) সেগুলোর ওপর প্রত্যয়ের সঙ্গে অবস্থান করা এবং সেগুলো যত বেশি পরিমাণে সম্ভব, সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস করা। [মালফুযাতে মাওলানা ইলয়াস রহ., পৃষ্ঠা- ১৬, বাণী-৭৫]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. কর্তৃক এভাবে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দেওয়া এবং জাযাউল আমাল ও রাহে নাজাতের মত বইগুলোর নাম এভাবে চিহ্নিত করে পড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করার পরও কি এ সুযোগ থাকতে পারে যে, তাবলীগের সাথী-সঙ্গীরা নিজেদের পড়াশুনা স্রেফ হায়াতুস সাহাবা ইত্যাদির মাঝে সীমিত রাখবেন! নয়তো কাজের স্তরে ধস নামবে!

আরেকটি অনুরোধ

আপনার সমীপে পূর্ণ বিনয়ের সঙ্গে আরো একটি অনুরোধ পেশ করতে চাচ্ছি যে, মাশাআল্লাহ, বর্তমানে তাবলীগের মেহনত আপনার নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে। আপনি তাবলীগের সকল যিম্মাদারেরও যিম্মাদার। তাঁদের সকল বয়ান ও তাঁদের যাবতীয় কথাবার্তার ওপর আপনাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আমাদের অনেক পুরনো সাথী ও তাবলীগের যিম্মাদার হযরাত এমন কিছু কথা বলে বেড়াচ্ছে, যা অবিবেচনাপ্রসূত ও বাস্তবতা বিবর্জিত। তাদের মাধ্যমে কথাগুলো সবখানে ছড়িয়ে পড়ছে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি কথা তুলে ধরছি-

১. নামায কি খুরুজের তারগিব মাত্র!

হাতুড়া বান্ধার তাবলীগি ইজতিমায় ফজর পরবর্তী বয়ানে মুম্বাইয়ের আমির সাহেব বয়ানে বলেছেন, 'আজান হল তাশকিল। নামায এ দিকে তারগিব যে, নামাযের মাঝে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উৎসাহব্যঞ্জক আয়াতসমূহ পড়ানো হয়। আর নামাযে পর খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া) এবং দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া) হল তারতিব।'

এ ধরনের বয়ান থেকে বুঝে আসে যে, আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া ও মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া। আযান ও নামাযের মত ইবাদতও সেই খুরুজ ফি সাবিলিল্লাহ ও দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্যে মাধ্যম মাত্র। কেমনযেন আযান ও নামায স্বতন্ত্র ও মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং তা উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম মাত্র।

এ ধরনের আরো কিছু কথা অন্য যিম্মাদারদের মুখেও বলতে শোনা যায় যে, 'দাওয়াত ইলাল্লাহের তারতিব ও তাশকিলের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয নামায (ঈশার নামায) বিলম্বিত করেছেন।' এ কথা থেকেও এ পরিণতি বেরোয় যে, দাওয়াত ইলাল্লাহই মূল উদ্দেশ্য। নামাযের বিপরীতে এর গুরুত্ব বেশি।

এখানে স্পষ্ট করা আবশ্যক মনে করছি যে, এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ ও এ ধরনের কিছু কথা আল্লামা মওদুদি সাহেব বলেছিলেন। যেগুলো থেকে বুঝে আসে যে, কেমনযেন ইবাদত, আযান, নামায, প্রভৃতি মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং এগুলো হল আসল উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম। আসল উদ্দেশ্য জিহাদের ট্রেনিং। বাস্তবতা হল, একথাগুলো শতভাগ অশুদ্ধ। আমাদের আকাবির রহ. এর অপনোদন করেছেন, প্রত্যাখ্যান করে কলম ধরেছেন। মুফাক্কিরে ইসলাম মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলি নদভি রহ. স্বরচিত গ্রন্থ 'আসলে হাযির মেঁ ইসলাম কি তাফহিম ও তাশরিহ' [ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ] গ্রন্থে মাধ্যম ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বিশদ নিরীক্ষণধর্মী আলোচনা করেছেন। দেখুন, বইয়ের ৮২ পৃষ্ঠা।

আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের তাবলীগি বলয়েও এখন এ ধরনের কথা চর্চিত হচ্ছে। একজন অপরজন থেকে নকল করে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘাঙ্গিকতার ভয়ে আমি বিশদ বিবরণে যাচ্ছি না।

২. সাইয়্যেদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম কি তাওহিদ ও তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ করেছিলেন?

দ্বিতীয় উদাহরণ, দিল্লির মারকাযের একজন যিম্মাদার সাহেব লাখনৌ মারকাযে আসেন। বৃহস্পতিবার মাগরিবের পর তাঁর বয়ান ছিল। আমি সেই বয়ানে উপস্থিত ছিলাম। সেই বয়ানে তিনি কামেল তাওহিদ, গায়রুল্লাহ থেকে মুখাপেক্ষীহীনতা এবং গায়রুল্লাহ অভিমুখী হওয়ার কঠোর নিন্দা করেছেন। দলিল হিসেবে তিনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করেন যে, জেলখানার ভেতরে তিনি অন্য বন্দিকে এ অনুরোধ করেছিলেন যে, اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين। অর্থাৎ 'আমার কথা তোমার মনিবের কাছে আলোচনা করবে। ফলে তিনি জেলের ভেতর কয়েক বছর অবস্থান করেন।' অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ কথা বলে গায়রুল্লাহর দ্বারস্থ হয়েছিলেন। যার পরিণতিতে তাকে আরো কয়েক বছর জেলবন্দি থাকতে হয়।'

একজন নবি সম্পর্কে সাধারণ উম্মতের মুখে এ ধরনের কতটা ধৃষ্টতাপূর্ণ! আল্লামা ইবনে কাসির রহ. তাঁর তাফসির গ্রন্থে উক্ত আয়াতের তাফসিরে এ ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি বর্ণনা অপনোদনের উদ্দেশ্যে নকল

করেছিলেন। নকল করে তিনি শক্ত ভাষায় এর অপনোদন করেন যে, এর সনদে একের পর এক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। বর্ণনাটি হল দুর্বল বর্ণনাকারীদের আস্তাকুড়। এটি প্রত্যাখ্যাত, অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য। [ইবনে কাসির, পৃষ্ঠা- ৪৭৯, খণ্ড- ২]

আমার লেখা 'কাসাসুন নবিয়্যীন' গ্রন্থে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওই ঘটনার অধীনে স্পষ্টাকারে লিখেছি যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের এই পদক্ষেপ প্রমাণিত করে যে, প্রয়োজনের সময় মাধ্যম-উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের উপকরণকে তার যথাস্থানে রেখে গায়রুল্লাহকে বলা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শফি সাহেব রহ. লেখেন, 'ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেল থেকে মুক্তি পেতে ওই বন্দিকে বলেছিলেন, যখন বাদশার কাছে যাবে তখন আমার কথাও বলবে যে, ওই নিরপরাধ লোকটি কারারুদ্ধ হয়ে আছে। এর থেকে বুঝে আসে যে, কোনো বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে কোনো ব্যক্তিকে মাধ্যম বানানো তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। [মাআরিফুল কুরআন, পৃষ্ঠা- ১৫৫, খণ্ড- ৪, সূরা ইউসুফ]

কিন্তু আমাদের তাবলীগি যিম্মাদার সাহেব পূর্ণ শক্তিমত্তা ব্যয় করে অকপটে এমনভাবে আলোচনা করেছেন যে, এর দ্বারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের শানে এ বেয়াদবি প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি –নাউযু বিল্লাহ– গায়রুল্লাহর দ্বারস্থ হয়ে কামালে তাওহিদ বা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ করেছেন। যার পরিণতিতে তাঁকে আরো সাত বছর অন্তরীণ থাকতে হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসির রহ. যেই অভিমত কঠোর ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেটাকেই এই যিম্মাদার নিজ বয়ানে জোর দিয়ে বলেছেন। ভরা মজলিসে অন্য সাথীরা কথাগুলো শুনে নিজেদের এলাকায় বর্ণনা করা শুরু করে দেয়।

তর্কের খাতিরে যদি মেনে নিই যে, আসবাবের স্তরে রেখে মাখলুককে বলা ও গায়রুল্লাহর কাছে যাওয়াটা যদি নবুওয়াতের উচ্চ মর্যাদা, কামালে তাওহিদ ও তাওয়াক্কুলের সুউচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী হয় তাহলে এ প্রশ্ন উঠে যে, বিভিন্ন গাযওয়া, বিশেষত হুনাইনের যুদ্ধে যখন রণাঙ্গনের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠে, তখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যয়ের হিমালয় হয়ে অবিচল ছিলেন। ওই সময় তিনি 'আসবাব

হিসেবেই' সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন জামাতকে নাম ধরে ধরে ডেকেছিলেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম রাদি. আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। এভাবে পরাজয় বিজয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্ণনায় আছে,

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادى أصحاب السرة. (الصحيح لمسلم، فتح الملهم، صـ: ١٢٩)

তাহলে বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আসবাব-মাধ্যম হিসেবে' বিভিন্ন মাখলুককে ডেকেছেন, একেও কি আপনি আপনার ভাষায় নবুওয়াতের পদমর্যাদা, কামালে তাওহিদ ও তাওয়াক্কুলের সুউচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী ঠাওরাবেন?'

ঘটনা হলো, আমাদের অনেক বুযুর্গ ও তাবলীগি আকাবির নিজ বয়ানের মাঝে সতর্কতা অবলম্বন করেন না। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা আপনি নিজেই বলেছেন। যেখানে তাঁর শানে অমর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। একটু আগে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত একটি বয়ানের কথা বললাম। সেখানেও অমর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বয়ান করা হয় যে, তিনি গাছের আশ্রয় প্রার্থনার কারণে কঠোর নিন্দার সম্মুখীন হয়েছিলেন।' এ কথাগুলো এক মুখ-দু মুখ হয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের শানে অমর্যাদার দুয়ার খোলা হচ্ছে। লোক অনায়াসে সেই দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এদিকে দৃষ্টি দিন। এই দুয়ার বন্ধ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অন্য নবীর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তাঁর নবীকূল শিরোমণি হওয়া সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তুলনা করতে গেলে যেহেতু অন্যদের অবমূল্যায়ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথবা অমার্যাদা ঘটে, যা আদৌ কাম্য নয়, এজন্যে তিনি এমন দূরবর্তী শঙ্কা থেকেও নিজ উম্মাতকে বারণ করেছেন। তিনি অমর্যাদার আশঙ্কা করে মোটা দাগে ইরশাদ করেছেন যে, আমাকে মুসা আলাইহিস সালাম, ইউনুস আলাইহিস সালামের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো না। لا تفضلوني على الأنبياء، لا تخيروني على موسى. এগুলো আমার কথা না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রত্যেক নবির অমর্যাদার ক্ষুদ্র সম্ভাবনা থেকেও উম্মাতকে রক্ষা করেছেন। অথচ আমাদের কিছু তাবলীগি যিম্মাদার হযরত গুরুত্বের সঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালামের এ ধরনের ঘটনাগুলো এমনভাবে বয়ান করে বেড়াচ্ছেন যে, আবশ্যিকভাবে সেখানে মহান নবিদের অমর্যাদা করা হচ্ছে। পরিতাপের বিষয় হলো, সাধারণ জনগণের মাঝে কথাগুলো 'বড়দের' মাধ্যমে ছড়াচ্ছে।

এই প্রবণতা কীভাবে বন্ধ করা যায়, তা গভীরভাবে ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

ওয়াস সালাম
মুহাম্মদ যায়দ

ঘটনা হলো, আমাদের অনেক বুযুর্গ ও তাবলীগি আকাবির নিজ বয়ানের মাঝে সতর্কতা অবলম্বন করেন না। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনা আপনি নিজেই বলেছেন। যেখানে তাঁর শানে অমর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত একটি বয়ানের কথা বললাম। সেখানেও অমর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কেও বয়ান করা হয় যে, তিনি গাছের আশ্রয় প্রার্থনার কারণে কঠোর নিন্দার সম্মুখীন হয়েছিলেন।' এ কথাগুলো এক মুখ-দু মুখ হয়ে সাধারণ জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের শানে অমর্যাদার দুয়ার খোলা হচ্ছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এদিকে দৃষ্টি দিন। এই দুয়ার বন্ধ করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো অন্য নবীর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বয়ান করতে নিষেধ করেছেন; অথচ তাঁর নবীকূল শিরোমণি হওয়া সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তুলনা করতে গেলে যেহেতু অন্যদের অবমূল্যায়ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথবা অমার্যাদা ঘটে, যা আদৌ কাম্য নয়, এজন্যে তিনি এমন দূরবর্তী শঙ্কা থেকেও নিজ উম্মাতকে বারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো প্রত্যেক নবির অমর্যাদার ক্ষুদ্র সম্ভাবনা থেকেও উম্মাতকে রক্ষা করেছেন। অথচ আমাদের কিছু তাবলীগি যিম্মাদার হযরত গুরুত্বের সঙ্গে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের এ ধরনের ঘটনাগুলো এমনভাবে বয়ান করে বেড়াচ্ছেন যে, আবশ্যিকভাবে সেখানে মহান নবিদের অমর্যাদা করা হচ্ছে। পরিতাপের বিষয় হলো, সাধারণ জনগণের মাঝে কথাগুলো 'বড়দের' মাধ্যমে ছড়াচ্ছে।

মাওলানা যায়দ মাযাহেরি

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আসআদ
আন্ডলিয়া, ঢাকা
015 11 52 50 70

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্যবাড্ডা। বাংলাবাজার।
যাত্রাবাড়ি। সিলেট।
019 24 07 63 65